মূলপাতা

নারীত্ব

Shihab Ahmed Tuhin

April 6, 2018

10 MIN READ

তিনি উচ্চ শিক্ষিতা। একটি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে খুব ভালো ফলাফল করে সে বিশ্ববিদ্যালয়েরই শিক্ষক হয়েছেন। সবরকম ডিগ্রী যখন ব্যাগে ভরা হয়েছে, তখন তার বয়স ত্রিশ পার হয়েছে। প্রচণ্ড আত্মসম্মান নিয়ে চলেন। সে আত্মসম্মানের কারণেই হয়তো কখনো ঘর বাঁধা হয়ে উঠেনি। কারণ, নারীর সব আত্মসম্মান একজনের সামনেই চূর্ণ হয়। চূর্ণ হতে হয়। যে নারী চিন্তা করে সে তার স্বামীর সাথে অহম দেখিয়ে চলবে, সে কেবল নপুংসকের সাথেই ঘর করতে পারবে। হাঁ, মানুষ মাত্রই আমিত্বের জায়গাটা থাকবে। তবে সে আমিত্ব সবার সামনে লাগামছাড়া হলে হোক, সমস্যা নেই। কিন্তু স্বামীর সামনে একটু বেশি হলেই সব ভেঙ্গে যায়।

বাসায় উনাকে খুব বোঝানো হয়েছে। মা বুঝিয়েছে, বাবা বুঝিয়েছে। বোন বুঝিয়েছে। বুঝাতে বাদ থাকেনি পাশের বাড়ির খালাও। কিন্তু তার এক কথাই, “আমি এতো উচ্চ শিক্ষিত মেয়ে! কোন পুরুষের অধীনে আমি থাকব? নো! নেভার!”

বাবা-মা দুনিয়া ছেড়ে চলে গেছে। একসময় তার বয়স চল্লিশ পার হয়েছে। ঢাকায় বড় একটা বাড়িতে একাই থাকেন। সারাদিন ক্লাস, পড়াশুনা নিয়ে বেশ কেটে যায়। একদিন ডাক্তার দেখাবে বলে ছোট বোন তার বাড়িতে আসে। সাথে বাচ্চা একটা মেয়ে। এখনো ফিডার ছাড়তে পারেনি।

বোন অসুস্থ থাকায় ছোট্ট মেয়েটাকে বেশিরভাগ সময় তাকেই দেখতে হয়। ফিডার খাওয়াতে হয়, কোলে নিয়ে ঘুম পাড়াতে হয়। কাপড় নষ্ট করলে পাল্টে দিতে হয়। অনেকের কাছেই কাজগুলো বিরক্তিকর। তবে অবাক হয়ে তিনি লক্ষ করলেন, এসব করতে তার একটুও খারাপ লাগছে না। কোথা থেকে যেন অদ্ভুত মায়া কাজ করছে শিশুটার প্রতি। ক্লাসে গেলেও বাচ্চাটার কথা মনে পড়ে। বাবুটা ঘুমিয়েছে তো? খেয়েছে তো? মেয়েটা বিছানায় ঘুমোতে পারে না। বুকের উপর রেখে ঘুম পাড়াতে হয়। চিন্তার ভীড়ে ক্লাস নেয়াতে বিঘ্ন ঘটে। এবার তিনি বিরক্ত হন। আজব তো! বোনের বাচ্চা, নিজের তো আর না।

তবে বিরক্তিটা বেশি দিন উনার বাসায় থাকে না। বোন সুস্থ হয়ে মেয়েকে নিয়ে চলে যায়। উনি চাচ্ছিলেন, যাতে তারা আর কিছুদিন থেকে যায়। কিন্তু পরের বাসায় এতোদিন কে থাকে? হোক না আপন বোন! বোনের মেয়ে চলে যাবার পর হুট করে একদিন উনি ভার্সিটি থেকে রিটায়ার নিয়ে নিলেন। কোথাও কোন খোঁজ নেই। এক মহিলা খোঁজখবর নিতে বাসায় গেলেন। অনেক ডেকেও কোন সাড়া না পাওয়ায় দরজায় কান পেতে শুনলেন, কেউ একজন বাচ্চা-ভোলানো গান গাচ্ছে। ভেতরে যেয়ে যা দেখলেন, তাতে তার পুরো শরীর বরফের মতো হিম হয়ে গেলো-

এলোমেলো চুলে অগোছালো বেশে সেই প্রফেসর এক পুতুলকে বুকে নিয়ে ঘুম পাড়াচ্ছেন। কখনো ফিডারে করে দুধ খাওয়াচ্ছেন। পাগলের মতো হাসছেন। অপ্রকৃতিস্থ সে প্রফেসরকে তারপর কোথায় নেয়া হয়েছিলো, তিনি আদৌ সুস্থ হয়েছিলেন কিনা তা জানা যায়নি।

কাছাকাছি এমন একটা গল্প শায়খ আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর রহিমাহুল্লাহ স্যারের মুখ থেকে শুনেছিলাম। তিনি বলেছিলেন, “কেউ যখন তার স্বভাবজাত ফিতরাতকে মেরে ফেলতে চায়, সে ফিতরাত কিন্তু মরে যায় না। বরং বিকৃতরূপে প্রকাশ পায়।” উনার ক্ষেত্রে ঠিক তাই হয়েছিল। বহু আগে তিনি নিজের মাতৃত্বকে মেরে ফেলতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তা মরে যায়নি। প্রকাশ পেয়েছে অন্যভাবে। বিকৃতরূপে।

মহিলা সমাজবিজ্ঞানী এন্নি মোয়ের-এর একটি বই আছে। নাম ‘Brainsex’। সেখানে তিনি নারী-পুরুষের মানসিক ও দৈহিক ভিন্নতা খুব চমৎকারভাবে তুলে ধরেছেন। তিনি লিখেছিলেন, “একজন মহিলা যতোবেশি পুরুষের মতো হতে চাইবে, তাকে

ততোবেশি নিজের সত্তাবিরোধী হতে হবে। নিজের স্বভাবজাত আচরণের বাইরে যেতে হবে।” আর স্রষ্টা যে ব্লুপ্রিন্ট আমাদের মধ্যে গেঁথে দিয়েছেন, তার বাইরে গিয়ে কেউ কখনো ভালো থাকতে পারেনি। থাকতে পারবেও না।

জীবনের কোন এক সময়ে তার মধ্যে হাহাকার সৃষ্টি হবে স্বাভাবিক জীবনের জন্য। নিজের চোখে পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর বাচ্চাটার মুখে সবচেয়ে সুন্দর ‘মা’ ডাক শোনার জন্য। মন খারাপের রাতে কারো কাঁধে মাথা রেখে কেঁদে কেঁদে শার্টের কলার ভিজিয়ে দেয়ার জন্য। আজ যারা আস্তবড় লালটিপ কপালে দিয়ে, পুরুষতান্ত্রিক সমাজের সব নিয়ম ভেঙ্গে দেয়ার কথা বলছেন, সংসার নামক বন্দীত্বের শেকল থেকে মুক্ত হবার কথা বলছেন, সেই প্রৌঢ়া নারীদের একটু একান্তে ডেকে জিজ্ঞেস করেই দেখুন না, তাদের সুন্দর সাজানো গোছানো সংসারের জন্য আফসোস হয় কিনা! কারো কোলে বাচ্চা দেখলে নিজের জন্য এমন একটা শিশু পেতে হাহাকার সৃষ্টি হয় কিনা! হয় তারা ক্লান্ত চেহারায় স্বীকার করে নিবে নিজের পরাজয়ের কথা। আর অস্বীকার করলেও তাদের মিথ্যা বলাটা কারো চোখ এড়াবে না। তসলিমা নাসরীনের মতো নারীবাদী(!) মহিলাও সাবেক প্রেমিক রুদ্রের জন্য মাঝে মধ্যে মন খারাপ করা কথা লিখেছেন। যদিও তার ভক্তরা সেসব উল্লেখ করে না। তার ভক্তরা উনার একটা কবিতা প্রায়ই উল্লেখ করে। সাবেক প্রেমিক রুদ্রকে উদ্দেশ্য করে তিনি সেই কবিতা লিখেছিলেন-

“তার চেয়ে কুকুর পোষা ভাল
ধূর্ত যে শেয়াল, সেও পোষ মানে
দুধ কলা দিয়ে আদরে আহলাদে এক কবিকে পুষেছি এতকাল
আমাকে ছোবল মেরে
দেখ সেই কবি আজ কিভাবে পালায়।”

রুদ্রও বেশ কড়াভাবে কবিতার উত্তর দিয়েছিলেন। সেটাও বেশ জনপ্রিয়-

“তুমি বরং কুকুর পোষো
প্রভুভক্ত খুনসুটিতে কাটবে তোমার নিবিড় সময়,
তোমার জন্য বিড়ালই ঠিক,
বরং তুমি বিড়ালই পোষো
খাঁটি জিনিস চিনতে তোমার ভুল হয়ে যায়
খুঁজে এবার পেয়েছ ঠিক দিক ঠিকানা

লক্ষ্মী সোনা, এখন তুমি বিড়াল এবং কুকুর পোষো
শূকরগুলো তোমার সাথে খাপ খেয়ে যায়,
কাদা ঘাঁটায় দক্ষতা বেশ সমান সমান।
ঘাঁটাঘাঁটির ঘনঘটায় তোমাকে খুব তৃপ্ত দেখি,
তুমি বরং ওই পুকুরেই নাইতে নামো
পঙ্ক পাবে, জলও পাবে।
চুল ভেজারও তেমন কোন আশঙ্কা নেই,
ইচ্ছেমত যেমন খুশি নাইতে পারো।

ঘোলা পানির আড়াল পেলে
কে আর পাবে তোমার দেখা।
মাছ শিকারেও নামতে পারো
তুমি বরং ঘোলা পানির মাছ শিকারে
দেখাও তোমার গভীর মেধা।

তুমি তোমার স্বভাব গাছে দাঁড়িয়ে পড়ো
নিরিবিলির স্বপ্ন নিয়ে আর কতকাল?
শুধু শুধুই মগজে এক মোহন ব্যাধি
তুমি বরং কুকুর পোষো, বিড়াল পোষো,
কুকুর খুবই প্রভুভক্ত এবং বিড়াল আদরপ্রিয়
তোমার জন্য এমন সামঞ্জস্য তুমি কোথায় পাবে ?”

তসলিমার ভক্তরা দাবী করতেই পারে, যে নিজ প্রেমিককে এভাবে আঘাত করে লিখতে পারে সে আসলেই নারী স্বাধীনতায় বিশ্বাসী। বনিবনা হয়নি? গেট-লস্ট! পুরুষের সাথে ঘর করে যেতে হবে এমন ব্যাকওয়ার্ডচেতনায় সে বিশ্বাসী না।

তবে নারী মানেই নারী। তসলিমা যতোই নগ্নতা, উদ্যম যৌনতার পক্ষে কলম ধরুক না কেন কখনো কখনো তার কলম চিরেই আবার দীর্ঘশ্বাস বেড়িয়ে এসেছে। এরপর আরো বেশ কয়েকজনকে বিয়ে(!) করেছেন। বেশ কয়েকজনের সাথে শুয়েছেন। সেগুলো বেশ খোলাখুলিভাবে বর্ণনাও করেছেন। কিন্তু তারপরেও কোথায় যেন একটা শেকল তাকে সবসময় বেঁধে রেখেছিল।

কখনো কখনো তসলিমার লেখা থেকে বের হওয়া দীর্ঘশ্বাস-ই প্রমাণ করেছে যতই দেহ স্বাধীনতার কথা বলুক না কেন, সে আসলে প্রথম স্বামী রুদ্রের কাছেই চেয়েছে সারাটা জীবন কাটিয়ে দিতে। তার মায়ার বাঁধনেই সংসার পাততে। রুদ্রের সাথে বিচ্ছেদের পর তার অনুভূতির কথা শোনা যাক তার জবানিতেই-

“প্রতিদিন সেই আগের মত আবার ঠিক আগের মতও নয়, ডাকপিয়নের শব্দে দৌড়ে যাই দরজায়। কারও কোনও চিঠির জন্য আমি অপেক্ষা করে নেই জানি। কিন্তু চিঠির ভিড়ে চিঠি খুঁজি, একটি চেনা চিঠি খুঁজি, যে চিঠির শব্দ থেকে একরাশ স্বপ্ন উঠে ঘুঙুর পরে নাচে, যে চিঠির শব্দ থেকে রুপোলি জল গড়িয়ে নেমে আমাকে স্নান করায়। জানি যে আগের মত তার কোনও চিঠি আমি আর কোনওদিন পাবো না, তারপরেও ভেতরে গুঁড়ি মেরে বসে থাকা ইচ্ছেরা অবাধ্য বালিকার মত হুড়মুড় করে কী করে যেন বেরিয়ে আসে। আসলে এ আমি নই, অন্য কেউ চেনা হাতের লেখার চিঠি না পেয়ে দীর্ঘ শ্বাস ফেলে।

প্রতিদিন ডাকপিয়নের ফেলে যাওয়া চিঠি হাতে নিয়ে সেই দীর্ঘশ্বাসের শব্দ শুনি আমি। আমার নয়, অন্য কারও। কোথাও কোথাও গোপন কুঠুরিতে লুকিয়ে থাকা সেই অন্য কাউকে ঠেলে সরাতে চাই দূরে, পারি না। রুদ্রর চিঠি আর কখনও পাবো না জানি, তবু বার বার ভুলে যাই, প্রতিদিন ভুলে যাই যে পাবো না। ছাইএর ওপর উপুড় হয়ে অপ্রকৃতস্থের মত খুঁজতে থাকি তিল পরিমাণ স্বপ্ন কোথাও ভুল করে পড়ে আছি কি না।

ফেব্রুয়ারিতে ঢাকার বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গনে বইমেলায় প্রতি বিকেলে হাঁটতে হাঁটতে চেনা কবি সাহিত্যিকের সঙ্গে দেখা হয়, কথা হয়, এমনকী কারও কারও সঙ্গে মেলার ভেতর চায়ের দোকানে বসা হয়, আড্ডা হয়, কিন্তু চোখ খুঁজে ফেরে একটি চেনা মুখ, একজোড়া চেনা চোখ। চোখের তৃষ্ণাটি নিয়ে প্রতিরাতে ঘরে ফিরি।

তবে একদিন দেখা মেলে তার, আমার ভেতরের আমিটি আমাকে পা পা করে তার দিকে এগিয়ে নেয়। ইচ্ছে করে বলি, ‘তুমি কি ভাল আছ? যদি ভাল আছ, কি করে ভাল আছ? আমি তো ভালো থাকতে পারি না! এই যে আনন্দ করছ, কি করে করছ? আমি তো পারি না। দীর্ঘ দীর্ঘ দিন পারি না।’ কোনো কথা না বলে তাকে দেখি, বন্ধুবেষ্টিত রুদ্রকে অপলক চোখে দেখি। ইচ্ছে করে বেষ্টন ভেদ করে রুদ্রর সামনে গিয়ে দাঁড়াই, হাত ধরে তাকে নিয়ে আসি, সেই আগের মত দুজন পাশাপাশি হাঁটি মেলার মাঠে। ইচ্ছেগুলো নাড়ি চাড়ি, ইচ্ছেগুলোর সঙ্গে কানামাছি ভোঁ ভোঁ খেলি। ইচ্ছের চোখে কালো রুমাল বেঁধে দিয়ে দৌড়ে পালাই, জিতে গেছি ভেবে অট্টহাসি হাসি। আমি হাসি, নিজের কানে শুনি কান্নার মত শুনাচ্ছে।”
[দ্বিখণ্ডিত- তসলিমা নাসরিন, পৃষ্ঠাঃ২৯-৩০]

কখনো আবার প্রেমিকের কথা স্মৃতিচারণ করেছেন এভাবে-

“আমাকে সকাল বলে ডাকতে তুমি।
কতোকাল ঐ ডাক শুনি না। তুমি কি আকাশ থেকে
সকাল, আমার সকাল বলে মাঝে মধ্যে ডাকো?
নাকি আমি ভুল শুনি?”

আহারে! কী প্যাথেটিক সেই জীবনদর্শন। যে দর্শন জিতে যেয়েও হারিয়ে দেয়। প্রতিটা মুহূর্ত নিজেকে পরাজিত করে নিজের বিবেকের কাছে।

স্বাধীনতার নামে পরিয়ে দেয় অদ্ভুত এক শেকল!

শাব্দিকভাবে ‘ফেমিনিস্ট’ মানে বোঝানো উচিত তাদেরকে, যারা তাদের নারীসত্তাটাকে সবসময় আঁকড়ে ধরে রাখতে চাইবে। একজন সত্যিকারের নারী হিসেবে বাঁচতে চাইবে। তবে বাস্তবতা একেবারেই উল্টো। আজ তাদের নারীবাদী বলা হয় যারা আসলে নারীত্বটাই বিসর্জন দিতে বলে। যে নারী আজ ঘর সংসারের মায়া ত্যাগ করে বাইরে বেশি বেশি সময় ব্যয় করতে পারে, জানোয়ারূপী পুরুষদের সামনে সাহসী পদক্ষেপে অদেখাকে দেখিয়ে দিতে পারে, পোশাক কিংবা কথা-বার্তায় বা চালচলনে পুরুষদের সাথে পাল্লা দেয়ার ব্যর্থ চেষ্টা করে, তারাই আজ তাদের চোখে নারীবাদী। তারা দাঁড় করিয়েছে নারী-পুরুষের সমতার এক মিথ্যা মূর্তি, যার ধর্মীয়, সামাজিক এমনকি বৈজ্ঞানিক ভিত্তিও নেই। মহিলা সমাজবিজ্ঞানী এলিস রসি তাই বলেছেন, “নারী-পুরুষ ভিন্নতাটা বায়োলজিকাল। অন্যদিকে, সমতার যে বুলি ছড়ানো হয়, সেটা পুরোটাই পলিটিকাল।”

তাই সত্যিকারের নারীবাদী হতে চাইলে স্রষ্টা আপনাকে যে নারীত্বের সংজ্ঞা দিয়েছেন তাকে আঁকড়ে ধরুন। আসমান ও জমীনের রব আল্লাহ্ তা’আলার চেয়ে আপনাকে আর কে বেশি ভালো চেনে? তিনি কুরআনে প্রথম আপনাদের কী হিসেবে উল্লেখ করেছেন জানেন? কোন কর্মী হিসেবে না। সাহসী চেতনার ধারক হিসেবেও না। বরং আদমের সঙ্গী হিসেবে (বাকারা ২:৩৫)। জান্নাতের মতো নিয়ামতে থেকেও আদম (আ) যাকে মিস করেছিলেন আপনি তারই বংশধর।

একজন নারী হিসেবে তারপরেও মেনে নিতে না পারলে চোখ বন্ধ করে কিছু দৃশ্য কল্পনা করুন তো-
একটা মেয়ে এক গাঁদা ছেলের সামনে বসে বিড়ি ফুঁকছে। আরেকজন বাসভর্তি পুরুষের সাথে কাকঝোলা হয়ে অফিসে যাচ্ছে। সে পুরুষগুলোর হাত সুযোগ পেলেই বিভিন্ন জায়গায় ছোটাছুটি করছে। অন্য একজন জিন্সের প্যান্ট আর টি-শার্ট পরে “প্রাণের উৎসবে” মেতে উঠছে। কেমন লাগছে দৃশ্যগুলো। স্বাভাবিক ঠেকছে? আনন্দে চোখ চকচক করছে? তাহলে আপনার জন্য দুঃসংবাদ। আপনি যে ফিতরাতকে মেরে ফেলতে চাচ্ছেন, তা একদিন বিকৃত প্রেতাত্মা হয়ে আপনাকে মেরে ফেলবে। ফেলবেই ফেলবে।

নারীর নারীত্ব প্রকাশ পায় যখন কোন এক শিশু তার কাঁধে মাথা দিয়ে নির্ভার হয়ে ঘুমিয়ে যায়। কিংবা কান্নার সময় যখন সে কোলে নিয়ে “বাবু আমার! কাঁদে না, কাঁদে না”- বলে একবার বাচ্চাটিকে ডানে তারপর বামে নিয়ে দোল খাওয়াতে থাকে। সদ্য স্কুলে যাওয়া ছেলেটা যখন লাফ দিয়ে মায়ের কোলে ঝাঁপ দেয়। যখন শাসনের সুরে স্বামীর ব্যাগে সে টিফিন ক্যারিয়ার ঢুকিয়ে দেয়। বলে, “এগুলো না খেয়ে বাইরে খেলে আমি আর রান্না করব না, দেখে নিও।” যখন স্বামী মুগ্ধ হয়ে গোসল শেষে তাকে চুল আঁচড়াতে দেখে। সামান্য কারণেই যার গাল কখনো রাগে, কখনো বা লজ্জায় লাল হয়ে যায়। ভরা জোছনায় যার গুনগুন করা গানে পৃথিবীতে স্বর্গ নেমে আসে। যে শুধু নিজে স্বপ্ন দেখতে জানে না, পুরো পরিবারকে স্বপ্ন দেখাতে জানে। সে “কোয়ালিটি টাইম”- এর থিওরী দিয়ে নিজের সন্তানদের শৈশবকে ধ্বংস করে না। বরং নিজের পুরো জীবন জুড়েই কাছের মানুষদের কোয়ালিটি টাইম দেয়। আর তাই তার জীবনটাও সন্তানদের কাছ থেকে একটুখানি “কোয়ালিটি টাইম” পাওয়ার আক্ষেপে শেষ হয় না। বরং গভীর ভালোবাসার অশ্রুজলে সে সিক্ত হয়।

হ্যাঁ, সবার জীবনের গল্প এক হয় না। কাউকে সংগ্রামের জীবন বেছে নিতে বাধ্য করা হয়। আবার কাউকে ভোগের পর কিছু জানোয়ার এ নিষ্ঠুর সমাজের মধ্যে ফেলে দেয়। তখন সে জিন্দিকের জীবন বেছে নেয়। বেছে নিতে বাধ্য হয়। যিনি সকল

কাজের হিসেব নেন, তিনি অবশ্যই এ অবিচারেরও হিসাব নিবেন। কিন্তু যাদের প্রয়োজন নেই, তারা কেন পশুদের আহ্বানে নিজেদের অস্তিত্বকে বিসর্জন দিচ্ছেন? নিজের জীবনের সেরা রত্নটি হারিয়ে কীসের পিছনে ছুটছেন? কী পাবেন আপনি? নিজের রবের কাছে না চেয়ে রাস্তায় দাঁড়িয়ে আন্দোলন করে কী অর্জন করতে চান?

আন্দোলন করে অধিকার আদায় করা যায়। ভালোবাসা নয়।